শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত : দর্পণ এবং অন্যান্য কয়েকটি উপন্যাস

শর্মিষ্ঠা নাথ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দর্পণ (প্রথম প্রকাশ ১৯৪৫) উপন্যাসটিকে বাংলা সাহিত্যের ধারায় একটি ব্যতিক্রমী সংযোজন হিসাবে আলোচনা না করাটাই এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।[১] সংক্ষেপে যদি এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু ধরে নিই শ্রমিক জীবন ও আন্দোলন এবং মধ্যবিত্ত নেতৃত্বের ভূমিকা, তবে গত শতকের তিরিশের দশকের মাঝামাঝি থেকে লেখা বহু উপন্যাসেরই বক্তব্য-বিষয় প্রায় অনুরূপ। ১৯৪৪-এ বেরিয়েছে জ্যোতির্ময় রায়-এর উদয়ের পথে, ১৯৩৯ থেকে ১৯৪০ — একবছর ধরে বামপন্থী মাসিক পত্রিকা অগ্রণী-তে প্রকাশিত হয়েছে বিশ্ব বা বিশু বিশ্বাসের উপন্যাস মজদুর। ১৯৪৬-এ আত্মপ্রকাশ করেছে শ্রমিক নেতা মনোরঞ্জন হাজরার লেখা নবজীবনের পথে। ১৯৪৮-এ প্রকাশিত হল বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের নবসন্ন্যাস দু-খণ্ডে। রানিগঞ্জ বরাকর অঞ্চলের কয়লাখনির মজদুরদের জীবন ও তাদের সমবেত করার প্রয়াস নিয়ে এই বই লেখা। আরও তাৎপর্যের বিষয় হল ১৯৩৯-এই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের চৈতালী ঘূর্ণী এবং নীহারকুমার পালচৌধুরীর চটকল (নাটক) প্রকাশিত হয়েছে। অথচ ১৯৩৪ সালে ২/২ বাগবাজার স্ট্রিটের শ্রমিক পাবলিশিং হাউস থেকে শ্রমিক সাহিত্য সিরিজ-এর প্রথম সংখ্যা বাঙ্গালার শ্রমিক-এর লেখক রমণীরঞ্জন গুহরায় যে অভিযোগ করেছেন তা কিন্তু যথেষ্ট প্রণিধানযোগ্য:

> বাঙ্গালা ভাষায় শ্রমিক সাহিত্যের খুবই অভাব। গত পঞ্চাশ বৎসরের জাতীয় জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্নমুখী উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইলেও দেশের শ্রমিক কৃষকদের জীবনযাত্রা, আর্থিক দুরবস্থা এবং সংগঠনের ভাবধারা লইয়া খুব কম লেখাই বাহির হইয়াছে...। ইহা... সমাজের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চিন্তাধারার দারিদ্র্যসূচক। কারণ সাহিত্যিকরা সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণী। ইহাতে আছে শ্রেণী চৈতন্য (Class consciousness) এবং ইহার পরিণতি হইতেছে শ্রেণীসংগ্রাম (Class war)। সুতরাং ইহাতে আছে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থের হানির সম্ভাবনা।
>
> অবশ্য একথাও স্বীকার্য, পৃথিবীর যে দেশেই গণজাগরণ সাফল্য লাভ করিয়াছে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের দানই সে সাফল্যের মূলে...প্রধান খোরাক জোগাইয়াছে। তাহার নিদর্শন বিংশ শতাব্দীর সোভিয়েট রাশিয়া।...সুতরাং বিলম্বে হউক, অবিলম্বে হইক আমাদের দেশেও গণজাগরণের প্রথম পথ প্রদর্শক যে সমাজের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্য থেকেই আসিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বাঙ্গলা দেশে অর্থাৎ যাহার শ্রমিক কৃষক আন্দোলনের নেতা হিসাবে রাজদ্বারে দণ্ডিত হইয়াছেন তাহারা সকলেই মধ্যবিত্ত, কি হিন্দু কি মুসলমান। যদিও ইহা ঐতিহাসিক সত্য যে, ইহার পরে যে অবস্থাটা আসিবে সেদিন কিন্তু ইঁহাদিগকে এই স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখা যাইবে না। তখন ইহারাই গণবিপ্লবের পথে বাধা হইয়া দাঁড়াইবেন।

দীর্ঘ অভিযোগটির উত্তরে হয়তো মধ্য-তিরিশ থেকে শ্রমিক জীবন নিয়ে লেখা গল্প উপন্যাসগুলির প্রসঙ্গ আনা যায়। কিন্তু লেখকের আশঙ্কা (এবং বইতেও তিনি বার বার সেকথা বলেছেন) অবাঙালি শ্রমিক অধ্যুষিত শিল্পগুলি সম্পর্কে শিল্পায়ন প্রক্রিয়ায় সম্পর্কবিহীন বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যে সাহিত্য সৃষ্টি করবে তা হয়তো রোমান্টিক কল্পনাবিলাসের অতিরিক্ত কিছু হবে না এবং ওই সাহিত্যের ভোক্তা হিসাবে শ্রমিককে কখনোই তাঁরা ভেবে দেখবেন না। আশঙ্কটা অমূলক নয় কারণ ইতিমধ্যেই তিনি দেখেছেন যে বাঙালি মধ্যবিত্ত রাজনীতিকেরা শ্রমিকদের একটি সম্ভাবনামূলক উপাদান হিসাবে চিহ্নিত করে তাদের অসন্তোষে নাক গলিয়েছেন, শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন করার চেষ্টা করেছেন, বিভিন্ন মতাবলম্বী রাজনীতিকেরা নিজেদের ভাবধারায় শ্রমিক আন্দোলনকে পরিচালিত করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এই সক্রিয়তায় প্রথম দিকে ইন্ধন জুগিয়েছিল মূলত অবাঙালি শ্রমিকদের জীবনযাত্রার ধরন যা বাঙালি সমাজের নৈতিকতার মাপকাঠিতে নেহাতই অনৈতিক বলে প্রতিভাত হয়েছিল।[২] সুতরাং শ্রমিকজীবনে নৈতিকতাবোধের সঞ্চার করা মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী নিজের নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ব বলে মনে করেছিল।[৩]

অবশ্য দায়িত্বের বোধটা যে খুব ব্যাপক ছিল প্রথমদিকে তা বলা যাবে না। বরং বলা ভালো উনিশ শতকের শেষের দিকে শ্রমিকশ্রেণির প্রতি বাঙালি মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের দু-রকম দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ দেখা গিয়েছিল — একটি তাদের প্রতি বিরক্তি ও উদাসীনতার অনুভূতি এবং অপরটি তাদের প্রতি করুণা ও মনোযোগ। উনিশ শতকের শেষের দিকে যখন শিল্প ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং বাঙালিদের জায়গা নিতে থাকে বিহার ও যুক্তপ্রদেশ থেকে আসা শ্রমিক, তখন ওই অঞ্চলের হিন্দিভাষী মানুষের প্রতি বাঙালিদের যে ঐতিহ্যগত অবজ্ঞা ('মেড়ো' বা 'মেঢুয়া' সম্বোধন) ছিল তা ওই শ্রেণীর নীতিহীনতার বোধকে আরও জোরালো করে। ভাটপাড়ার এক ব্রাহ্মণ স্কুলশিক্ষক রামানুজ বিদ্যার্ণব তাঁর একটি কবিতয় চটকল ও মিউনিসিপ্যাল অফিস তৈরি হয়ে কীভাবে গ্রামগুলি অভাবিতভাবে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছিল তার বিবরণ দিয়েছেন। কবিতাটির সারার্থ হল যে ভাটপাড়া মিউনিসিপ্যালিটিকে ধন্যবাদ, কারণ তাঁরা কাঁকিনাড়া, জগদ্দলের জঙ্গল আর বাঁশঝাড় কেটে সাফ করেছে, যে জায়গাগুলো দখল করেছে মেড়ুয়াদের বস্তি, ফ্যাক্টরি, চিমনি। বাজারগুলো তাদের কোলাহলে পূর্ণ এবং ছুটির দিনে তারা মাতাল হয়ে কুকুরের ডাকের মতো গান গাইতে গাইতে শহরে 'দল' বেঁধে ঘুরে বেড়ায় (ভট্টপল্লী গাথা, ১৩১৩)।

এর ঠিক বিপরীতে ব্রাহ্ম সমাজ সংস্কারক শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উল্লেখ করা যায়, যিনি ১৮৬৬ থেকে ১৮৭৫ সালের মধ্যে বরানগর অঞ্চলে শ্রমিকদের মধ্যে বহু জনহিতকর কাজ করেন। ১৮৬৯-এ শ্রমিকদের জন্য নাইটস্কুল, ১৮৭১-এ আনা ব্যাঙ্ক ও ১৮৭৮-এ ভারত শ্রমজীবী পত্রিকা প্রকাশ করেন শ্রমের সম্মান প্রতিষ্ঠা করার জন্য। ১৮৬০ ও ১৮৭০-এ মদ্যপানবিরোধী আন্দোলনেও তিনি সক্রিয় ছিলেন। শ্রী কুলদাপ্রসাদ সান্যাল মল্লিক তাঁর নবযুগের সাধনা বইটিতে শশীপদবাবু সক্রিয়তার যে বর্ণনা দিয়েছেন তা থেকে কতকগুলি বিষয় পরিষ্কার হয়ে ওঠে। প্রথমত তিনি দেখিয়েছেন যে সাধারণ নিম্নশ্রেণির সঙ্গে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ইতিপূর্বে - আদান - প্রদানের যে জীবন্ত সম্বন্ধ ছিল, তা শিথিল হয়ে যাওয়ার বোধই শশীপদবাবুকে চালিত করেছিল। উপরন্তু তিনি অনুভব করেছিলেন যে পল্লিগ্রামের প্রলোভনহীন ও অনুত্তেজক সমাজ যেভাবে এই নিম্নশ্রেণির নৈতিক চরিত্র রক্ষা করত, তা নগরের স্বাধীন, উত্তেজক ও আদর্শহীন সমাজ রক্ষা করতে পারবে না। অর্থাৎ শ্রমিকরা যে অনেকটা

শিশুদের মতো, যারা নিজেদের ভালো বোঝে না— এই ধারণা নিয়েই তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন। শশীপদ ও তাঁর উপদেষ্টা ব্রিস্টলের মেরি কার্পেন্টারের কাছে শ্রমিকদের 'দারিদ্র্য, স্বাস্থ্যহীনতা বা বাসস্থানের অপর্যাপ্ততা' তাদের নৈতিক জীবনের দুর্বলতার পরিচয় বলেই মনে হয়েছে, কারণ 'ভালো ও নিয়মিত মজুরি' ও এই গরিবদের বিভিন্ন দুষ্কর্ম করতে প্ররোচনা দেয়, যদি না সামাজিক সংস্কারকেরা এগিয়ে আসেন। তিনি নিজেও শ্রমিকদের 'দায়িত্ববান স্বামী, স্নেহশীল পিতা ও শান্তিপূর্ণ প্রতিবেশী' করে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। অধিকন্তু তিনি শ্রমিকদের প্রত্যেককেই নিজের নিজের জাত ব্যবসা, যেমন তাঁত চালানোর অভ্যাস বজায় রাখতে বলেছিলেন, যাতে কল উঠে গেলেও তাদের বিপদে পড়তে না হয়।[৪]

শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সময় থেকে অর্থাৎ উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে বিশ শতকের তিরিশের দশক পর্যন্ত শ্রমিক মধ্যবিত্তের সম্পর্কের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গুণগত পরিবর্তন ঘটে, যার একটা প্রধান কারণ 'রাজনীতিতে সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণার অনুপ্রবেশ'। স্বদেশি আন্দোলনের বছরগুলিতে (১৯০৩-১৯০৮) শ্রমিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পায় এবং শ্রমিক আন্দোলনে জাতীয়তাবাদী মধ্যবিত্ত বাঙালির হস্তক্ষেপ ও জাতীয় কংগ্রেসের মাধ্যমে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ক্রমশ ব্যাপকতা পেতে থাকে।[৫] প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান ও অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা — এই দুই ঘটনার মধ্যবর্তী সময়ে বিভিন্ন কারণে (যথা, অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, রুশ বিপ্লবের সাফল্যের কাহিনি, হোমরুল লিগ ও রাওলাট সত্যাগ্রহ) শ্রমিক আন্দোলনের গতিবৃদ্ধি পায়।[৬] ১৯২০ সালে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠাকে একটি স্মরণীয় ঘটনা হিসাবে ধরা যেতে পারে। কিন্তু আগেই যেটা বলা হয়েছে অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা (যতই অস্পষ্ট হোক না কেন) এবং সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শে দীক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত যুবকের সংখ্যাবৃদ্ধি শ্রমিকশ্রেণী সম্পর্কে প্রচলিত যে নীতিবোধ বাঙালি মধ্যবিত্তকে আচ্ছন্ন করেছিল তা থেকে উত্তরণ ঘটাতে সাহায্য করে।[৭] ঐহিত্যগত অবজ্ঞার ভাষা থেকে গুণগতমানে উৎকৃষ্ট ভাষায় (যেমন খোট্টা বা মেড়ো থেকে শ্রমজীবী, মজদুর, শ্রমিক ইত্যাদি) অভিগমন-এ একটা প্রভাব বলে ধরা যেতে পারে। ভদ্রলোক রাজনীতিতে ১৯২৫ সালে লেবার স্বরাজ পার্টি, ওয়াকার্স এ্যান্ড পিজ্যান্টস পার্টি (১৯২৮) এবং ১৯৩২-এ লেবার পার্টি উদ্ভব এই পরিবর্তনের নিদর্শন। বাংলা কথাসাহিত্যে শ্রমিকের অন্তর্ভুক্তিও এই সময় থেকেই সূচিত হয় শৈলজানন্দের কয়লাকুটির গল্প বা প্রেমেন্দ্র মিত্রের পাঁক উপন্যাস দিয়ে। রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন, একটু নঞর্থক ভাবেই, এর ফলেই যেন সাহিত্যে একটা নতুন যুগ এসেছিল বলে মনে হয়েছিল।

বাঙালি ভদ্রলোকের কাছে তখনও শ্রমিকরা নৈতিক অবক্ষয়ের ছবিই প্রতিফলিত করত, কিন্তু উনিশ শতকের বিপরীতে এই 'অবক্ষয়' -এর জন্য এখন অর্থনৈতিক শোষণকেও দায়ী করা হচ্ছিল। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে অমৃতবাজার পত্রিকা-য় বলা হয় যে চটকলের মজুরদের অবস্থা মনুষ্যেতর প্রাণীদের মতো এবং তার কারণ হচ্ছে পুঁজিপতিদের অনিয়ন্ত্রিত লোভ ও আধুনিক শিল্পব্যবস্থা। এও বলা হয় যে, বেশির ভাগ শিল্পেই 'পুঁজি ও মজুরির ফারাক' উল্লেখযোগ্য।[৮]

সংক্ষেপে এই পরিপ্রেক্ষিত মাথায় রেখে আমরা দর্পণ এবং অন্যান্য উপন্যাসগুলির বিষয়বস্তু আলোচনা করব। এই আলোচনায় আমরা দুটি বিষয়ে ঔপন্যাসিকভেদে তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ করব — এক, শ্রমিকজীবনের বর্ণনা ও দুই, শ্রমিকদের সঙ্গে বহিরাগত মধ্যবিত্ত নেতৃত্বের সম্পর্ক এবং শ্রমিকদের নিজেদের ভিতর থেকে গড়ে ওঠা নেতৃত্বের প্রশ্ন।

ঔপন্যাসিক এবং তাঁর সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অবস্থান ভেদে বিভিন্ন সমস্যার ট্রিটমেন্টে কিছু পার্থক্য থাকবেই ধরে নিয়ে আমরা এগোব। যেমন ধরুন দর্পণ উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সদ্য উপনীত রাজনৈতিক আদর্শের প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই পাঠকের দৃষ্টিগোচর হয়, কারণ বামপন্থী রাজনীতির প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধির প্রক্রিয়াতেই তিনি ১৯৪৪-এ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। দর্পণ তার অব্যবহিত পূর্বেই (এপ্রিল ১৯৪২ থেকে জুন ১৯৪৩) পাটনা থেকে প্রকাশিত প্রভাতী পত্রিকায় প্রায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। অধ্যাপক সরোজ দত্তের ভাষায় 'যে উপন্যাসে বিক্ষোভ, প্রতিরোধ, সংগঠন, সমাবেশ, মিছিল, সংঘর্ষ একের পর এক এসে গিয়েছে মার্কসবাদের সূত্র মেনেই যেন' (সরোজ দত্ত : ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়) দর্পণে দুটি গল্প আছে অস্পষ্টভাবে — একটি ঝুমুরিয়া গ্রাম ও অন্যটি কলকাতা শহরের গল্প। কোনো নিটোল গল্প না থাকলেও মাহিনিটি মোটমুটি এরকম।

উপন্যাসের সূচনা ঝুমুরিয়া গ্রামের কৃষক বীরেশ্বর, তার মেয়ে রম্ভা ও কলকাতার এক কাঠের কারখানার শ্রমিক রামপালকে নিয়ে। উপন্যাসের গল্প এই চরিত্রগুলির সংগ্রামী চেতনার বিকাশ নিয়ে। বীরেশ্বর এমনিতে গোঁয়ার-গোবিন্দ চাষি মানুষ, কিন্তু 'ভালোমন্দ পছন্দ অপছন্দের একটা বিচারবুদ্ধি আছে বীরেশ্বরের, যা প্রায় ঘনিষ্ঠতার কারণে পুলিশ তাকে ধরে, সে জেলও খাটে। সে জানে তার দেশের গরিবেরা যে কষ্ট পায় তা তুলনারহিত। তার মেয়ে রম্ভাও ওই প্রতিবাদী লড়াকু প্রকৃতির উত্তরাধিকারী বলা যায়। রম্ভা ও বীরেশ্বর কলকাতায় গিয়ে গ্রামসুবাদে পরিচিত শিল্পপতি লোকনাথের বাড়িতে অতিথি হয়। এখানেই অবতীর্ণ হয় 'রামপাল' চরিত্রটি। সে লোকনাথের কাঠের কারখানার শ্রমিক। ম্যানেজার এক শ্রমিককে অন্যায়ভাবে মারায় তার প্রতিবাদ করতে গিয়ে সে শ্রমিকদের নেতা বনে যায়, যদিও সে মোটামুটি নিরীহ স্বভাবসম্পন্ন ছিল। পরবর্তী ঘটনাচক্রে রম্ভার সঙ্গে তার বিবাহ হয়।

কলকাতায় এই শ্রমিক আন্দোলনের নেতা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবক কৃষ্ণেন্দু বা কেষ্টবাবু, উপন্যাসে দেখি, যাঁর গ্রহণযোগ্যতা শ্রমিকসমাজে প্রায় অবিসংবাদিতভাবে স্বীকৃত। যদিও তার বিশেষ কোনো সংগঠনের কথা বলা নেই, সে শ্রমিক-কৃষকের বিপ্লবী রাজনীতি করে। সে কলকাতার শ্রমিকদের বস্তিতে যেমন পরিচিত, তেমনি গ্রামীণ কৃষকসমাজেও গৃহীত। অনবরত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সে তার চেতনাকে বাড়িয়ে নেয়। সে জানে 'সমস্ত স্বীকৃত সত্যগুলিকে নতুন দৃষ্টির বিচার করার, যাচাই করে নেবার দিন এসেছে। দার্শনিকের দৃষ্টিতে নয়, বৈজ্ঞানিকের।' লোকনাথের কাঠের কারখানায় শ্রমিকদের বিক্ষোভের মধ্যে হঠকারিতা ছিল, আন্দোলনের কৌশলে যে ভুল ছিল তা সে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। সাময়িক উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে যে রামপাল স্বতঃস্ফূর্ত নেতা হয়ে উঠেছিল, তাকে প্রকৃত সংগ্রামের পথে টেনে আনায় প্রয়াসী হয়। কৃষ্ণেন্দুর সঙ্গী হিসাবে আরিফ, মমতা ও হীরেনের নাম পাওয়া যাচ্ছে। হীরেন শিল্পপতি লোকনাথেরই ছেলে, শ্রমিক স্বার্থ নিয়ে পিতার সঙ্গে তার সংঘর্ষ হয়। কিন্তু

কৃষ্ণেন্দুর মতো বাড়াবাড়িতে সে বিশ্বাসী নয়। শ্রমিক কৃষকদের মধ্যে সংস্কারমুক্ত চিন্তা ও চেতনার উন্মেষ ঘটাতে নীতিপদ্ধতিতে সে তীক্ষ্ণ সমালোচনা করে বলে 'ধর্ম আর সংস্কার এ দেশের মাটিতে গভীর শিকড় চারিয়ে দিয়েছে সেটা অনস্বীকার্য সত্য। এদেশে সংস্কার মুক্ত চেতনার উন্মেষ ঘটাতে গেলে সেটাকে স্বীকার করে নিয়েই তাকে ভাঙাতে হবে, তাতে ধর্মপাগল মানুষগুলির মনের অনেক কাছাকাছি অনেক সহজে পৌঁছে যাওয়া যাবে।' মানিকের নিজেরও দৃঢ় বিশ্বাস ছিল 'সমাজের যে স্তরে যার বাস সে তেমনি করে ফিলসফিকে ঢেলে গড়ে নেয়।' কৃষ্ণেন্দুকেও মানতে হয়েছে, রাজনীতি না করলেও হীরেন 'দেশের মানুষকে অনেক ভালোভাবে বোঝে।' মমতা অধ্যাপক কন্যা, শ্রমিক-দরদি এবং শ্রমিকজীবন সম্পর্কে তার কিছু Pre-conceived notion আছে। কৃষ্ণেন্দুর মধ্যস্থতায় হীরেনের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। কিন্তু শ্রমিকজীবনে তার কৌতূহলের অত্যন্তিকতা মেটাতে মমতা নিজে বস্তিবাসী হয় হীরেন ও কৃষ্ণেন্দুর আপত্তি সত্ত্বেও। প্রাণপণ প্রচেষ্টাতেও ওই জীবন সে মানিয়ে নিতে পারে না, শ্রমিকরাও তাকে গ্রহণ করে না। বোধহয় ওই ব্যর্থতা দেখানোও লেখকের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। এরকম আরও বহু ছোটোখাটো ঘটনার মাধ্যমেই বহিরাগত মধ্যবিত্ত নেতৃত্বের সঙ্গে শ্রমিকদের অনিবার্য ব্যবধানগুলি দেখানোই লেখকের অন্যতম উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়।

এই উপন্যাসের শেষভাগে একটি গল্প আছে, যা উপন্যাসের চূড়ান্ত বিন্দু রচনা করেছে। ঝুমুরিয়া গ্রামে লোকনাথ প্রেরিত ঘনকাটায় ঠিকাদার হেরম্ব চক্রবর্তীর সঙ্গে গ্রামের মানুষের সংঘাতকে কেন্দ্র করে এই গল্প। হেরম্ব প্রথমে সাঁওতালদের দিয়ে কাজ করাত। কিন্তু একটি সাঁওতালি মেয়ের উপর জোর খাটাতে গিয়ে সব সাঁওতালকে সে খেপিয়ে তোলে। লোকের জন্য ঝুমুরিয়ার চাষিদের দ্বিগুণ মজুরি দিতে প্রতিশ্রুত হয়েও লোক না পাওয়াতে তার ধারণা হয় বীরেশ্বর ও তার বন্ধু জালালুদ্দীনের জন্যেই সে লোক পাচ্ছে না। মিথ্যে মামলায় সে দুজনকে জেলে পাঠায়; তাদের খেতের পাকা ফসল নষ্ট করে এবং জালালুদ্দীন এই দুঃখে মারা যায়। এর পর নানা অত্যাচার করে যেমন কমদামে চাল কিনে, ভালো জমিকে অনাবাদী করে কম দাম দেখিয়ে সে বীরেশ্বরের প্রতিবাদী সত্তাকে জাগিয়ে তোলে ও গ্রামে দাঙ্গা বাধায়। দাঙ্গা চলাকালীন বীরেশ্বরকে হেরম্ব খুন করে, গ্রামের কিছু নিরীহ লোক দোষী সাব্যস্ত হয়, ভীরুরা গোপনে আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু বীরেশ্বরের চোটো ছেলে মোহনলাল, জালালুদ্দীনের ভাই সহীউদ্দীন ও গ্রামের আরও কিছু মানুষ এই জুলুমের প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। কলকাতা থেকে কৃষ্ণেন্দু ও হীরেন, রম্ভা ও রামপাল ঝুমুরিয়া আসে। মোহনলাল গ্রেপ্তার হলেও গ্রামের লোকেরা অবিরাম প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত করে এবং নিজেদের সচেতনতাতেই তা সম্পন্ন হয়। কৃষ্ণেন্দু, মোহনলাল প্রমুখের অনুপস্থিতিতে নিজেরাই তারা 'বাঘের মত' জেগে ওঠে। পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয় হেরম্বের লরি আর তাঁবুতে। রামপাল হেরম্বকে মারতে গিয়ে নিজে মৃত্যুবরণ করে, হেরম্বকে বাঁশ দিয়ে চেপে জনতা হত্যা করে। গ্রামের বাঘ জেগে উঠেছে, এই খবর দিয়েই উপন্যাস শেষ হয়।

দর্পণ প্রকাশিত হবার এক যুগেরও আগে প্রকাশিত হয়েছে তারাশঙ্করের চৈতালী ঘূর্ণী (১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে)। এর বীজটি তিনি উপ্ত করেছিলেন কালিকলম পত্রিকায় ১৯২৮ সালে 'শ্মশানের পথে' নামক একটি গল্পে, যেটিতে গোষ্ঠ নামে এক কৃষকের সর্বস্বান্ত হওয়ার কথা ছিল। তার উত্তরকালে শ্রমিকজীবনের গল্প নিয়েই চৈতালী ঘূর্ণী-র সূচনা।[৯] এই উপন্যাসের পটভূমিতে রয়েছে রাঢ় বঙ্গের একটি গ্রাম ও গোষ্ঠ নামে একটি নিপীড়িত কৃষক চরিত্র। গ্রামটি এককালে শস্য শ্যামলা ছিল। পরবর্তীকালে অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, অজন্মা ইত্যাদি প্রাকৃতিক কারণে ও জমিদার - মহাজনের যৌথ শোষণে বন্ধ্যা হয়ে যায়; গোষ্ঠর সমস্ত জমি তাদের কাছে বাঁধা পড়তে থাকে। নিরুপায় গোষ্ঠ খুন করে জমিদারের চাপরাসিকে এবং স্ত্রী দামিনীকে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে পালায়। দ্বিতীয়পর্বে ভূমিচ্যুত গোষ্ঠ আধা শহরে মজুরের কাজ নেয় ধানকলে। কারখানা সংলগ্ন বস্তির অপরিচিত আবহাওয়া ও অনাত্মীয়তা তাদের রুদ্ধশ্বাস করে তোলে। শ্রমিক জীবনের বীভৎসতা, নিঃস্বতা ও শালীনতাবোধের অভাব তাদের গা-সহা হয়ে এলেও কৃষক ও গ্রামজীবনের মূল্যবোধ দামিনীকে পীড়িত করে। শেষ পর্বে দেখা যাচ্ছে গান্ধিভক্ত দুই চাকুরে বাবু যথাক্রমে সুরেন ও শিবকালীর উদ্যোগে মজুরিবৃদ্ধির দাবিতে শ্রমিক ইউনিয়ন তৈরি হয় ও ধর্মঘট বাঁধে। কিন্তু ইউনিয়নের ভিতরেই দুই সম্প্রদায়ের দাঙ্গা বাধে ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়া নিয়ে এবং দাঙ্গায় আহত গোষ্ঠ হাসপাতালে মারা যায়।[১০]

এই উপন্যাসে গ্রামজীবনে কৃষকের উপর জমিদার-মহাজনের শোষণের বর্ণনায় তারাশঙ্কর যতটা তথ্যনির্ভর ও নিরপেক্ষ, ততটাই সহৃদয় তা তথ্যনিষ্ঠ তিনি শ্রমিক জীবনের বীভৎসতা বর্ণনাতেও। কিন্তু গ্রামজীবনের প্রতি শহরে নব আগন্তুক শ্রমিকের যে টান তা যেন প্রকৃতপক্ষে শিল্পশ্রমিক জীবনের পরস্পর বিচ্ছিন্নতার প্রতি লেখকের নিজেরই খানিকটা অসহনীয়তার বোধকে প্রতিফলিত করছে। যেমন, গোষ্ঠ ও দামিনীর গ্রাম জীবনের বহু দুঃখ ও বস্তিজীবনের তুলনায় সহনীয় হওয়ার ব্যাপারটা উল্লেখ করা যেতে পারে। কিংবা উপন্যাসের একজন মজুর যখন বলে যে গ্রাম সুবাদে 'গাঁয়ের মুচিও মামা হয়' তখন এক বিশেষ ধরনের সামাজিক সম্পর্কের বয়ানে গ্রামজীবনের প্রতি লেখকের পক্ষপাতিত্ব খানিকটা অনুভব করা যায়।

এই পক্ষপাতিত্বের সামান্য বিপরীত ও পুরো বিপরীত দুটি বর্ণনা আমরা উদ্ধৃত করব। প্রথমটি দর্পণ থেকে, দ্বিতীয়টি বামপন্থী লেখক মনোরঞ্জন হাজরার নবজীবনের পথে উপন্যাসটি থেকে। প্রথমটিতে ঝুমুরিয়া গ্রাম থেকে বিয়ে হয়ে কলকাতা শহরের বস্তিতে এসে পড়েছে রম্ভা। তার অভিজ্ঞতাটা দেখা যাক।

> স্বামীর ঘর করতে এসেই রম্ভা টের পায়, সে এক নতুন জগতে এসে পড়েছে, ঝুমুরিয়ায় তার এতদিনের পরিচিত জগতের সঙ্গে যার মিল বড়োই কম। স্থানের সংকীর্ণতা আর আলো বাতাসের অভাবটাই প্রথমে যেন তার দম আটকে দিতে চায়। দিনের বেলাতেও ছায়ান্ধকার এতটুকু স্যাঁতসেঁতে বাড়িতে একগাদা পাকাপোক্ত হৃদয়হীন অদ্ভুত খাপছাড়া মানুষের ভিড় তাকে সারাদিন অনুভব করায় যে সে যেন হাট-বাজারের জেলখানাতে বন্দিনী।... উঁচু মাটির ভিটায় বড়ো বড়ো ঘর, মস্ত উঠানে সকাল থেকে সন্ধ্যাতক রোদের ছড়াছড়ি... আর বাড়িভরা গেঁয়ো আপনজনগুলির সাহচর্য, এই সমস্তের অভাবটাই তার প্রায় অসহ্য মনে হয়।... কিন্তু সামলে নেয়। সইয়ে নেয় রম্ভা, চারদিকের সংকীর্ণ কুঁকড়ে -যাওয়া বিকৃত জীবনের কুৎসিত কদর্যতাকেই একমাত্র চরম সত্য বলে মেনে না নিয়ে সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য খুঁজে বার করার চেষ্টায় উঠে পড়ে লেগে যায়। তখন সে সাহস পায়, আর ধৈর্য আসে।...গাঁয়ের জীবনে নোংরামি কম নেই। তবে সেখানে মানুষ ছড়িয়ে থাকে তফাতে তফাতে। এখানে সংকীর্ণ স্থানে গাদাগাদি করে আছে ঊর্ধ্বশ্বাস স্বার্থপর নিষ্পিষ্ট মানুষ। এই

স্তূপীকৃত পাপ ও বিকারের মধ্যে এসে পড়ায় প্রথমে রম্ভা দিশাহারা হয়ে গিয়েছিল, ক্রমে ক্রমে সে ভাবটা কেটে যায়। একদিন দুপুরবেলা যেচে পাড়ার কয়েকটি দেহবেচা মেয়ের সঙ্গে আলাপ করে এসে সে খানিকটা স্বস্তি বোধ করে। এদের সম্বন্ধে তার একটা উদ্ভট, বীভৎস ধারণা ছিল, তার মনে হত এদের কাছাকাছি দাঁড়ালেই বুঝি পচা গন্ধ এসে নাকে লাগবে। বরং দেখে সে অবাক হল, গেরস্থ অনেক মেয়ের চেয়ে এরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, অন্য মানুষের মতোই এদের সুখ দুঃখ স্নেহ মায়া আছে, ভালোমন্দ উচিত অনুচিত বোধ আছে, এমনকী উদারতা পর্যন্ত আছে খানিকটা!

তারশঙ্করের প্রায় বিপরীত অনুভূতি বর্ণনা রয়েছে মনোরঞ্জন হাজরার নবজীবনের পথে উপন্যাসে।[১১] সংক্ষেপে উপন্যাসের কাহিনিটি এরকম। একদিকে রয়েছে গ্রামীণ অভিজাতদের সাধারণ মানুষ ও কৃষকদের উপর অত্যাচার, অন্যদিকে দলাদলি, কুসংস্কারে জীর্ণ এবং যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষে জেরবার মানুষের বর্ণনা। এই মানুষগুলির জীবনে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত সৃষ্টি করে গ্রাম্য অভিজাতরা নিজেদের ক্ষমতা বাড়িয়ে নেয়। এই গ্রামেরই দরিদ্র কৃষক বিজয়, যার বোন সীতা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট যোগেশবাবুর কর্মচারী নফর ভট্টাচার্য কর্তৃক অপহৃত ও নিহত হয় এবং বহুদিন পর মাঠের জমিতে তার কঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে শহরের বস্তিতে শ্রমিক বন্ধু হরিহরের কাছে বিজয়ের গমন ও দুর্ভিক্ষের ত্রাণবন্টন নিয়ে গ্রাম্য নেতাদের প্রবঞ্চনা গ্রামের লোকেদের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। শ্রমিকদের একতাপূর্ণ জীবনযাপন বিজয়কে মুগ্ধ করে এবং কমিউনিস্ট শ্রমিক নেতাদের সুসংবদ্ধ কার্যকলাপ, বিশেষত ত্রাণবন্টন তাকে নতুন জীবন দান তরে। গ্রামে ফিরে সে মানুষকে বোঝায়, একত্রিত সমিতি নেয় নিজহাতে। গ্রামীণ সামাজিক নেতৃত্বের বিরাট অদলবদল ঘটে উপন্যাসের শেষে।

যে-মূল্যবোধের তফাত গ্রাম ও শহরের মধ্যে তারাশঙ্করকে পীড়িত করেছিল তা এখানে অন্তর্হিত। বরং ধরা রয়েছে এক অন্য বাস্তব— 'গ্রামে কৃষকেরা পাশাপাশি, ঠাসাঠাসি বাস করে বটে, কিন্তু তারা পরস্পরের কাছে কোনদিনই কাছাকাছি নয়। সর্বদাই যেন কেমন বিক্ষিপ্ত, পরস্পর পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন। গ্রামে সীতার উপর অত্যাচার করিয়া তাকে মৃত্যুহিম অন্ধকার পথে ঠেলিয়া দিয়া মাটির নিচে পুঁতিয়া ফেলা হয়, কুসুমের ঘর পুড়াইয়া দেওয়া, হয়, ...বারিলেশহীন ধূ ধূ করা শুষ্ক মাঠে ফসল হয় না, তবুও খাজনা গুলিতে হয়, ইউনিয়ন বোর্ডের কোন সুবিধাই কৃষক পায় না, তবু ট্যাক্স দিতে হয়।'

পক্ষান্তরে শ্রমিকজীবন সম্পর্কে দ্বিধা নিয়ে শহরে এসেও তাদের একতায় গ্রামের কৃষক বিজয় অভিভূত হয়ে যায়— 'আশ্চর্য এই শহরের জীবনযাত্রা। এখানে আসিয়া যেন বিজয়ের চোখ খুলিয়া গিয়াছে। যেন সে নতুনতর এক জগতের সন্ধান পাইয়াছে।... এখানকার মানুষ বিশেষ করিয়া... শ্রমজীবী মানুষ ইহারা যেন এক অদ্ভুত কর্মব্যস্ততার ভিতর দিয়া কোন এক নবজীবনের পথে ছুটিয়া চালিয়াছে। চারিদেক ইহারা দলবদ্ধ। সবসময়েই ইহারা চলিয়াছে দল বাঁধিয়া, কারখানায় যায় দল বাঁধিয়া, কারখানা হইতে বাহিরে আসে দল বাঁধিয়া— দল বাঁধিয়া আবার নিশান কাঁধে করিয়া ইহারা নিজেদের দুঃখ দুর্দশার প্রতিকার করিতে আগাইয়া যায় বিপুল উদ্যমে।'

দৃষ্টিভঙ্গির তফাতটা কেবলমাত্র বামপন্থী ও অবামপন্থী লেখকের দোহাই পেড়ে করে ফেলাটা অযৌক্তিক হবে। বামপন্থী লোকদের নিজেদের মধ্যেও মিল অবশ্য খুব বেশিদূর টানা যায় না। অগ্রণী-তে প্রকাশিত শিব বিশ্বাসের মজদুর উপন্যাসের শ্রমিক জীবন বর্ণনায় দু-একটা পঙ্‌ক্তিই যথেষ্ট : 'ক্ষিপ্ন অবসন্ন কুলির দল, দলে দলে তাহাদের কুঠুরিতে ফিরিতেছে।... যন্ত্রদানবের ক্ষুধার পায়ে দেহের শক্তিকে ক্ষয় করিয়া ফিরিয়া আসে তাহারা— পুঞ্জীভূত ব্যর্থতাই শুধু মাত্র সম্বল।

নীরব বস্তিগুলি আবার কোলাহলে ভরিয়া উঠিল, ছোট ছোট কুঠুরীতে আবার বাতি জ্বালিল। গিন্নীরা দাওয়ায় উনুন ধরাইয়া রান্না করিতে বসিল। ছোট ছেলেমেয়েরা বড়দের হুকুম খাটিতে খাটিতে হয়রাণ হইয়া উঠিল।...

চারিদিকেই একটা বিরাট গুঞ্জন শুর হয়— কিন্তু এ আনন্দের উচ্ছ্বাস নয়, অবসন্নতার প্রলাপ।'[১২]

শ্রমিক জীবনের বীভৎসতা সম্পর্কে মজদুর উপন্যাসের এই হতাশার স্বর যেন তারাশঙ্করের মতেরই প্রতিধ্বনি। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, যিনি কয়লাখনির শ্রমিকদের নিয়ে নবসন্ন্যাস লেখার সময় গান্ধিজির দ্বারা অনেকটাই প্রভাবিত হয়েছেছিল, এবং উপন্যাসেও শ্রমিকদের সংস্কারের জন্য গান্ধির আদর্শে একটি আশ্রমের কথাও লিখেছিলেন, তাঁর লেখায় এই হতাশা আরও স্পষ্ট।[১৩] অবশ্যই 'ভাষার' ব্যবহারে কিছু পার্থক্য দৃষ্ট হয়। যেমন ধরা যাক টুলু (নবসন্ন্যাস উপনাসের প্রধান চরিত্র, একটি শিক্ষিত অল্পবয়েসি ছেলে) যেভাবে দেখছে কয়লাখনির বস্তিকে : 'লম্বা টানা খোলার চালের নিচে দুই সারি বাসা... মাঝখানে একটা নর্দমা একেবারে এ মুড়ো ও মুড়ো চলিয়া গেছে। সমস্ত জায়গাটা ব্যাপিয়া একটা তুমুল অরাজকতা—উলঙ্গ, অর্ধউলঙ্গ ছেলেমেয়েদের দল ছাগল, কুকুর, হাঁস, মুরগী, তাহাদের ছাড়া সব একসঙ্গে মিশিয়া গেছে। মেয়ে পুরুষেরাও প্রায় সবাই জীর্ণবস্ত্র পরিহিত... ঝগড়া, ইতর গালাগালিতে কান পাতা যায় না। পাঁচ ছয়জন লোক নেশা করিয়া জটলা করিতেছে।... এদের ঘিরিয়া বেশ একটি দল নাচিয়া, কুঁদিয়া, ছড়া আওড়াইয়া, নানারকম প্রশ্ন করিয়া ক্ষেপাইয়া তুলিয়াছে।...টুলু একটু স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল, বিষবায়ুর মধ্য দিয়া আসিতে আসিতে তাহারা মনটা নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল, এখানে আসিয়া যেন একেবারেই অসাড় হইয়া গেল।' বস্তির বর্ণনা দিতে গিয়ে টুলুর মনে হয়, 'গ্রামের মধ্যেও মানুষের দুঃখ কষ্ট দেখেছি, কিন্তু এরা যেন মানুষের স্তর থেকেই নেমে গেছে। ...আমি জ্যান্ত নরক দেখে এই ফিরছি স্যার।'

প্রকৃত পক্ষে কিন্তু বিভূতিভূষণের এই বর্ণনায় আতিশয্য নেই। মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক নিজে যে পরিচয় নির্দিষ্ট করে রেখেছিল শ্রমিকের জন্য, সে নির্বিবাদে সে পরিচয় গ্রহণ করেছে তার কাছে পরিচিত হবার জন্য। শ্রমিকদের ভদ্রলোকেরা যেমন ভাবতে চেয়েছিল এরা তাকে তেমনই ভাবতে দিয়েছে। দর্পণ উপন্যাস থেকে উদাহরণ দিয়ে এই অংশটুকু শেষ করা যাক। শ্রমিক-জীবনের সঙ্গে একাত্ম হবার আশায় ধনী কন্যা মমতা নিজে বস্তিবাসী হয়েছিল। শ্রমিকের সম্পর্কে যথাবিহিত ভাবে তার ধারণা ছিল যে তারা 'ছোটোলোক'। ছোটোলোক শ্রমিকদের সে বুঝিয়েছিল যে সে নিজেও আর 'ভদ্রলোক' থাকতে চায় না, 'ছোটোলোক' হয়ে যেতে চায়, সব বিভেদ ভুলে যেতে চায়। এই যুক্তি শ্রমিকদের কাছে গ্রহণীয় হয়নি। 'ছোটোলোক' বলার প্রতিবাদ এসেছে তাদের নিজেদের মধ্যে থেকেই। মমতার পরিস্থিতি তাদের জীবনযাত্রায় প্রথমদিকে কিছু কৃত্রিম সংযম আরোপ করতে বাধ্য করলেও, অচিরেই তারা নিজেদের স্বাভাবিক আচরণে ফিরে এসেছে। মমতা বুঝতে পারে যাদের সে বঞ্চিত, নিপীড়িত, দুঃখী ও

নিরীহ একদল মানুষ বলে মনে করেছিল, যাদের প্রাণহীন বলে মনে করেছিল, তাদের 'একটানা বিস্ফোরণের মতো সংশয়হীন প্রাণপূর্ণ প্রচণ্ড সংঘাতময় আত্মঘাতী জীবনের লীলা' তার একদিনকার ধারণাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবে।

প্রবন্ধের শেষাংশে আমরা এই প্রসঙ্গটিতেই যাব শ্রমিকজীবনে বহিরাগত নেতৃত্বের ভূমিকা ও শ্রমিকদের আত্মসচেতনার প্রশ্নে। শ্রমিক-মধ্যবিত্ত সম্পর্কের খতিয়ান এতেই স্পষ্ট হয়ে যাবে।

শ্রমিক আন্দোলনে বহিরাগত নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি জাতীয়তাবাদী ও বামপন্থী উভয় মহলই প্রচার করেছিল। যদিও নিখিলভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (AITUC) প্রতিষ্ঠাকালে সভাপতি লাজপত রাই আশা প্রকাশ করেছিলেন যে এখন কিছুদিন বুদ্ধিজীবীরা নেতৃত্ব দিলেও ক্রমে ক্রমে শ্রমিকেরা নিজেদের মধ্য থেকেই নেতা নির্বাচন করবে। বাম ঐতিহ্যে প্রোলেতারীয় নেতৃত্ব নিয়ে লেনিন ও রোজা লুক্সেমবার্গের যে দুটি বিরোধী মতাদর্শ আছে তার মধ্যে প্রথমটিই ভারতবর্ষে বামপরিচালিত শ্রমিক আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছে। লেনিন তাঁর What is to be Done-এ বলেছেন যে, শ্রমিকদের নিজেদের পক্ষে কেবল ট্রেড ইউনিয়নগত সচেতনতা তৈরি করা সম্ভব, যা পূর্ণ শ্রেণিসচেতনতা অপেক্ষা পৃথক। অন্যদিকে কেবল সম্পত্তিবান শ্রেণির শিক্ষিত প্রতিনিধিরাই বিভিন্ন দার্শনিক, ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিক তত্ত্বের ও তথ্যের ভিত্তিতে সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব তৈরি করতে পারেন। সুতরাং সর্বহারাকে নেতৃত্ব দেওয়ার বিশেষ ভূমিকা বুদ্ধিজীবীর। অন্যদিকে রোজা-র মতে কেবল সাধারণ মানুষই পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে এবং প্রত্যেক সর্বহারা তার কর্মদাতার বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করতে পারে।[১৪]

শ্রমিক আন্দোলনে বহিরাগতদের নেতৃত্ব আমাদের আলোচ্য উপন্যাসগুলিতে একটা অন্যতম স্থান নিয়েছে। বিষয়টিকে এইভাবেও ব্যাখ্যা করা যায় যে, শ্রমিক-জীবনে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের হস্তক্ষেপ একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল বলেই মধ্যবিত্ত লেখক একে বর্ণনা করতে উৎসাহবোধ করেছেন। ঐতিহাসিক সব্যসাচী ভট্টাচার্যের মতে, সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনে সম্ভবত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা থেকেই বহিরাগতদের হস্তক্ষেপ শুরু। বাম অভিমুখী ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা নিজেদের সমর্থনে বহিরাগতদের ভূমিকাতে নতুন মাত্রা যোগ করতেন এই দাবি করে যে তাঁরা শ্রমিকদের শ্রেণি সচেতনতা বাড়াচ্ছেন। শ্রমিকদের নিজেদের মধ্য থেকে নেতৃত্ব গড়ে ওঠার প্রশ্নও ঐতিহাহিকেরা আলোচনা করেছেন। সব্যসাচীবাবু যেমন 'আলভে'-র কথা বলেছেন, যিনি তাঁর স্মৃতিচারণে লিখেছেন কীভাবে দশ ঘন্টা মিলে কাজ করে তাঁর পক্ষে ইউনিয়নের কাজ করাটা কঠিন হয়ে উঠছিল।[১৫] অন্যদিকে ঐতিহাসিক দীপেশ চক্রবর্তী তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন শ্রমিকেরা নিজেদের স্বার্থে কীভাবে বহিরাগতদের ব্যবহার করত।[১৬] বহিরাগতদের পরিচয়ও কীভাবে সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ে বদলাত তাও ঐতিহাসিকেরা দেখিয়েছেন।

বহিরাগত নেতৃত্বের সঙ্গে শ্রমিকদের সম্পর্কের প্রশ্নে আমরা মজদুর, নবজীবনের পথে ও দর্পণ-এর তুলনামূলক আলোচনা করব। তিনটি উপন্যাসই বামপন্থায় বিশ্বাসী লেখকদের। কিন্তু দর্পণ-এর সঙ্গে বাকি দুটির পার্থক্যের নিরূপণ করাই আমাদের লক্ষ্য। নবজীবনের পথে ও দর্পণ -এর গল্পাংশ আগেই আলোচিত হয়েছে। সংক্ষেপে মজদুর-এর গল্প লক্ষ করা যাক।

মজদুর উপন্যাসে একটি পাটের কলের শ্রমিকদের দুঃখ দুর্দশা, মালিক পক্ষের অত্যাচার, নেতাদের প্রথমে অসহযোগিতা ও পরে সাহায্য দান, ধর্মঘটী শ্রমিকদের বস্তি থেকে উচ্ছেদ ও অনশন, সেনাবাহিনীর সাহায্যে মজুর ফৌজি গঠন ও শ্রমিক বিদ্রোহ বর্ণিত হয়েছে। কীভাবে শোষিত, অত্যাচারিত হতে হতে শ্রমিকেরা এককাট্টা হয়, কমিউনিস্ট মধ্যবিত্ত নেতারা কীভাবে শ্রমিকদের মনোবল তৈরি করে, দুর্দিনে তাদের পাশে দাঁড়ান তা দেখানো উপনাসের লক্ষ্য। মাসান নামে এক শ্রমিক দেরি করে আসায় কাজে বরখাস্ত হয় এবং ওই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় আরও দু-তিনজন শ্রমিকও বরখাস্ত হয়। মাসান ছিল চটকল শ্রমিকদের ইউনিয়নের উৎসাহী কর্মী। তাকে জেলে পাঠানো হয়। অপর একজন কর্মী হল সনৎ, যে আই এসসি পাস কিন্তু অন্যত্র চাকুরি না পাওয়ায় চটকলে কাজ করে। শ্রমিক ইউনিয়নের বহিরাগত নেতাদের মধ্যে কমরেড আব্দুল বারি, সান্যাল ও ভৌমিকের উল্লেখ পাওয়া যায়, যাঁরা সরকারের নতুন পাট আইনের ক্ষতিকর দিকগুলি (যেমন শ্রমিক ছাঁটাই, বেতন হ্রাস) নিয়ে শ্রমিকদের নতুনতর ধর্মঘটে সামিল করতে উদ্যোগী। শ্রমিকদের মধ্যে রোশেন আলি, বাবুলাল, মেয়ে শ্রমিক জাংলী ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগে কর্মচ্যুত এবং ধর্মঘট সংগঠনে উদ্যোগী। প্রথমে দ্বিধা জানিয়ে পরে বাকি শ্রমিকেরা এগিয়ে আসে। ক্রমে তাদের অবস্থা দীনহীন হয়ে পড়ে, খোলা আকাশের নীচে তাদের দিন কাটাতে হয় এবং সংবাদপত্রের মারফত খবর পেয়ে কংগ্রেসি নেতারাও অন্দোলনে সামিল হন ও চাল ডাল বিতরণ করেন ফৌজের মাধ্যমে। ফৌজ লালঝান্ডা ও মুসলিম শ্রমিকদের সরিয়ে আনার জন্য। এর মধ্যে নেপালি, পাঞ্জাবি শ্রমিক নিয়ে নতুন ভাবে কারখানা চালু করা হলে ধর্মঘটীদের দু-একজন ছদ্মবেশে ঢুকে পড়ে ওই নতুন শ্রমিকদেরও উত্তেজিত করে তোলে। পরিণামে মালিকপক্ষ সংগ্রামী শ্রমিকদের উপর পুলিশি নির্যাতন চালায়।

ঔপন্যাসিক কমিউনিস্ট নেতাদের ভূমিকা ও পরার্থপরতা নিয়ে নিঃসংশয়। দুজন কমিউনিস্ট নেতার উল্লেখ পাচ্ছি—কমরেড সান্যাল ও আব্দুল বারি, যাঁরা কলকাতা থেকে এসেছেন সদ্য শেষ হওয়া ধর্মঘট সম্পর্কে শ্রমিকদের দ্বিধা দূর করে তাদের পুনরায় ধর্মঘটে প্রবৃত্ত করতে, যাতে এবার তাদের আর্থিক লাভ হয়। এঁদের ভাষা লক্ষ করুন। 'সান্যাল... সবার মনে সংশয় ও অবসাদের ছায়া দেখিয়ে সকলকে সম্বোধন করিয়া আবেগময়ী কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, বন্ধুগণ, যে বৈষম্য, যে অন্যায়, যে সামঞ্জস্যের উপর এইসব আইনের ভিত্তি, তাহা চিরদিন টিকতে পারে না দুনিয়ায়। সর্বহারাদের অভিযান যে শুধু মুহূর্তের সাময়িক সুবিধা আদায়ের লাভ লোকসানের খতিয়ান নয়, সে দিনের পর দিন এরই ভিতর দিয়া চলিয়া গৃহহারা লক্ষ্মীছাড়া চিরনিপীড়িতদের চির আকাঙ্ক্ষিত সেই অনাগতকেই কবিকে আমন্ত্রণ।' কিংবা আব্দুল বারির বক্তৃতাটি শুনুন 'সেদিনকার সেই সাধারণ ধর্মঘটের কথা ভোলনি তোমরা, ভোলনি হয়ত তার সুখ দুঃখ, ব্যথা বিজড়িত পীড়ন আর ত্যাগের কথা। কিন্তু তা চেয়েও বিরাট ও ব্যাপক একটা সংগ্রাম আমাদের সামনে, আরও দুঃখময়, আরও কষ্টকর... যা একদিন পুঁজিবাদীও সর্বহারাদের চির দ্বন্দ্বের করবে শেষ মীমাংসা।

প্রশ্ন রাখা যায়, উপন্যাসের অন্যান্য অংশে শ্রমিকদের মুখে যে ধরনের ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি আরোপ করেছেন লেখক, তাতে নেতাদ্বয়ের বক্তৃতায় অংশবিশেষে যে ভাষার চমৎকারিত্ব দেখা গেল তা কি আদৌ কোনো বাণী প্রেরণ করতে পারল শ্রমিকদের কাছে, না ওই ধ্বনি-গাম্ভীর্যময় শব্দাবলির ঝঙ্কারই শ্রমিককে উদ্‌বুদ্ধ করল তার লুপ্ত উৎসাহ পুনরুদ্ধার করতে? যে-ভাষা ইউনিয়ন নেতারা পত্র-পত্রিকাটির উল্লেখ করা যায়। ১১ ডিসেম্বর, ১৯২৮ -এর সংখ্যাটিতে মোট চারটি পৃষ্ঠা, উপরে

কাস্তে হাতুড়ির ছাপ এবং ইংরেজিতে 'Workers of the World Unite' লেখা। এরপর বাউড়ির চটকলের ধর্মঘটের বিবরণ ও কংগ্রেস নিস্পৃহতার বর্ণনা ও পরের দুটি পৃষ্ঠায় স্থানীয় অফিসারদের কেচ্ছা ও স্থানীয় ক্ষোভ, টিটাগর পেপারমিল ও হাওড়া কুলিদের বর্ণনা রয়েছে। সাধু বাংলায় লেখা এই পত্রিকাটি কেবলমাত্র শ্রমিকদের সাধারণ জ্ঞান ও সার্থকতাকে প্রতিফলিত করেনি। তবে যেহেতু এটা সবার জন্য বিতরণ করা হয়েছিল ও তাদের কাছে পড়া হয়েছিল তাই হয়তো এর কিছু প্রভাব ছিল।

বামপন্থী নেতারা যে শ্রমিকদের দুরবস্থার মূল জায়গাটাতে অর্থাৎ labour ও capital এর দ্বন্দ্বে হস্তক্ষেপ করেছিলেন, ঔপন্যাসিক সেই জায়গাটিকে ঠিকঠাক করতে পেরেছেন। মজদুর উপন্যাসে দেখা যাচ্ছে, নেতারা পাট আইনের ক্ষতিকর দিকগুলি তুলে ধরে শ্রমিকদের মধ্যে প্রথম সারির নেতাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালিয়ে ধর্মঘট শুরু করার প্রস্তুতি সম্পন্ন করে। অর্থাৎ এ যেন ট্রেড ইউনিয়ন সচেতনতা জাগিয়ে বুদ্ধিজীবীর ধর্মঘট সংঘটনের চেষ্টা। এরপরেই শ্রমিকদের ধর্মঘটে সামিল হওয়ার কথা এসেছে এবং ইউনিয়ন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে সেটি 'ছোট হইলেও গত ধর্মঘটে ইহার কর্মীদের দান যৎসামান্য নয়।' উপন্যাসে 'অজয়' নামে আরও একটি ধনী ব্যক্তির কথা এসেছে শেষের দিকে, যিনি টাকা দিয়ে শ্রমিক আন্দোলনে সাহায্যের হাত বড়িয়ে দেন। শ্রমিকদের অগ্রণী অংশের মধ্যে এই নিয়ে সংশয় জাগলেও তাদের নিজেদের মনই একে যাথার্থ্য দেয় এই ভেবে যে 'দুই সমাজের এই সমান্তরাল ব্যবধানের ওপর এক ওভারব্রিজ... নিজেরাও যাইতে চায় ও অপরকে আসিতে দেয়।' শ্রমিকেরা যে সচেতন ইচ্ছা থেকেই কখনো কখনো অন্য শ্রেণিভুক্ত নেতাদের প্রাধান্য মেনে নিত, যা দীপেশবাবু বলতে, এ যেন তারই প্রতিফলন। কিন্তু মোটের উপর নেতাদের ভূমিকা শ্রমিকদের নিজস্ব 'এজেন্সি' কেউ ছাপিয়ে উঠেছে। অন্যদিকে মনোরঞ্জনবাবুর উপন্যাসে নেতৃত্ব নিয়ে শংসয় বা দ্বিধার কোনো জায়গা নেই, শুদু শহুরে নেতাদের ভাব, ভাষা, আত্মত্যাগ ইত্যাদির প্রতি শ্রমিকদের একটা সমর্পণ বা নিবেদনের ভাবটাই প্রধান। সাধারণ চাষি বা শ্রমিকদের কূপমণ্ডুকতা থেকে, ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধি থেকে কমিউনিস্ট নেতারাই তাদের উদ্ধার করেছেন, সেই কথাটা বারংবার ঘুরে ফিরে এসেছে। অবশ্য সংশয় বা দ্বিধার অবকাশ লেখক ওই নেতাদেরও দেননি। শ্রমিকদের বস্তুগত অবস্থার সঙ্গে তাঁদের পার্থক্যটাকে স্বতঃসিদ্ধ ধরে নিয়েই তাঁরা এগিয়েছেন। শ্রমিক আন্দোলনের নেতা হওয়ার সুবাদে এ অভিজ্ঞতা মনোরঞ্জন হাজরার নিজেরই ছিল।

ফিরে আসা যাক দর্পণ উপন্যাসে। লেখকের বামপন্থী রাজনীতির প্রতি সহানুভূতি তখন তুঙ্গে। কিন্তু উপন্যাসের বক্তব্যে তখনই যেন তিনি বোঝাতে চাইছিলেন যে দেশের সাধারণ মানুষের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা থাকা সত্ত্বেও, কর্মপদ্ধতির মধ্য দিয়েই দেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে কেমন যেন একটা ব্যবধান রচিত হয়ে যাচ্ছিল সমাজসচেতন, বাস্তববাদী রাজনৈতিক কর্মীদের। ফলে বারংবার দর্পণ উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে আত্মসমীক্ষা, আত্মবিশ্লেষণের মুখে দাঁড় করিয়েছেন লেখক। যেমন ধরুন, কৃষ্ণেন্দুর চরিত্রটি। শ্রমিকদের কাছে সে গ্রহণযোগ্য, কিন্তু সে জানে 'অভাগাদের চেয়ে তাকে বেশি টেনেছিল ওদের হয়ে লড়াই করার রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চার, বাহাদুরি মোহ।' তাই মমতা যখন তার কাছে গিয়ে বস্তিতে থাকার আবেদন জানায়, কুলি-মজুরদের প্রতি তার ভালোবাসার কথা জানায় তখন সে বোঝে যে 'এটা খাপছাড়া কিছু নয়, দোষেরও নয় মমতার পক্ষে নিজেদের কক্ষচ্যুত করার সাধ মমতাদের জাগা স্বাভাবিক।' ধনীকন্যা মমতাকে সে এই বলে নিরস্ত্র করতে চায় যে সে চেষ্টা করলেও শ্রমিকদের মধ্যে স্বচ্ছন্দভাবে কাজ করতে পারবে না। তার ভাষায় 'হয় তুমি ওদের ছাড়িয়ে অনেক ওপরে উঠে যাবে, অসাধারণ কাজ করবে, নয় তোমার কাজের বিশেষ কোনো মূল্য থাকবে না, জিদের বশে মনের জোরে কোনোমতে নিজেকে টেনে নিয়ে যাবে। আদর্শের জন্য হঠাৎ ত্যাগ করা আর আদর্শের জন্য হাসিমুখে দিনের পর দিন খেটে যাওয়া ভিন্ন জিনিস।' এই উপন্যাসে প্রচলিত বামপন্থী ধারণাণ সীমাবদ্ধতা ভেঙে শ্রমিকদের নিজেদের মধ্য থেকেই চেতনায়িত হবার ও নেতৃত্ব দানের বিষয়টিকে তিনি এনেছেন।

প্রকৃতপক্ষে উপন্যাসটির পূর্বনাম জাগো জাগো থেকে দর্পণ-এ রূপান্তর খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। পূর্বনামের তাৎপর্য এই উপন্যাস শুধুমাত্র শ্রমিক জাগরণমূলক উপনাসে পরিণত হতে পারত। এটা উল্লেখযোগ্য যে, জাগো জাগো উপন্যাস কিন্তু মানিক শেষ করেননি। অন্যদিকে দর্পণ প্রকৃত অর্থেই যেন মনের আয়নায় প্রতিফলিত প্রতিচ্ছবি। আসলে আত্মসমালোচনার মনোভাব থাকলেই যে কেবল স্বচ্ছ চিন্তার ধারা ক্রমশ শুকিয়ে যাবে না এই উপলব্ধি কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টিতে থাকাকালীন বারেবারেই তাঁর হয়েছে। বিশেষত বি টি রণদিভের উত্থানের পর অতি বামপন্থী রণনীতি ও রণকৌশল যেভাবে সাংস্কৃতিক ফ্রন্টেও ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছিল তা মানিক মেনে নিতে পারেননি। তাঁর নিজের লেখাতেই দেখি '...আমরাই লেখক শিল্পীরাই পাঠক ও দর্শক সাধারণের ঘাড়ে অযথা দোষ চাপাই, তাঁদের কতকগুলি সংকীর্ণতা ও বিরোধি স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিই। আসলে তাঁরা আমাদের সবরকম সুযোগ ও স্বাধীনতা দিতে সর্বদাই প্রস্তুত। আমরাই তাঁদের এই উদারতা স্বীকার করতে ভয় পাই। আমি বিশ্বাস করি নিজের এই দুর্বলতা চেনার ফলে আমার লেখার উন্নতি হবে।'[১৭]

শেষ জীবনে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে যে আত্মসমালোচনা, যন্ত্রণা ফুটে উঠেছিল, তা শিল্পী হিসাবে তাঁর দৃষ্টিকে প্রায় সম্পূর্ণতা দান করেছিল। ১৯৫৫ -তে তেলেঙ্গানা আন্দোলনের পর অন্ধ্রপ্রদেশের সাধারণ নির্বাচনে কমিউনিস্টদের হতাশাব্যঞ্জক ফলাফলের পর কিনি মানসিকভাবে পীড়া অনুভব করেন। শারীরিকভাবেও তিনি তখন অসুস্থ ছিলেন। ৫ মার্চ, ১৯৫৫ তে তাঁর দিনলিপির পৃষ্ঠায় এই যন্ত্রণার সঙ্গে আত্মসমালোচনাও রয়েছে : 'বিনয় শিখতে হবে, ঐতিহ্যকে বা বর্তমান সমাজকে ফুৎকারে উড়িয়ে দেবার দম্ভ ত্যাগ করতে হবে, মানুষকে ভালবাসতে হবে। আমি মার্কস্‌বাদী, আমি বৈজ্ঞানিক, আমি সব জানি, সংস্কার বা ভাবপ্রবণতার ধারা আমি ধারি না' —ত্যাগ করতে হবে এই দৃষ্টিভঙ্গিও।'[১৮] জীবনের শিল্পী ও তাত্ত্বিক হিসাবে তিনি স্বয়ং যে উপলব্ধি করেছিলেন, তা তাঁকে শ্রেষ্ঠ তত্ত্ববিদদের মর্যাদা দিয়েছে।

তথ্যসূত্র

১। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, দর্পণ, দি বুক এম্পারিয়াম লিমিটেড, ২২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা, প্রতম প্রকাশ ১৯৮৫, ব্যবহৃত সংস্করণ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র, চতুর্থ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা ৭০০০২০, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯, দ্বিতীয় সংশোধিত মুদ্রণ জুন ২০০৩।

২। বাংলাদেসের শিল্পগুলির মধ্যে আবার চটশিল্পে বা পাটের কারখানায় উনিশ শতকের শেষের দিকেও স্থানীয় লোকেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। কিন্তু মোটামুটি ১৮৯৫ থেকে ব্যবসা বাড়ার দরুণ এই শিল্প যখন অতিরিক্ত লোক সন্ধান করে তখন বিহার ও উত্তরপ্রদেশ থেকে অভিগমনকারীতে তা পূর্ণ হয়ে ওঠে। ১৯০৫ সালে ইদতাব তাঁর রিপোর্টে (Foley, Report, Par 28) বলেন যে, কুড়ি বছর আগেও যেখানে বাঙালিদের প্রাধান্য ছিল, সেখানে এখন দুই তৃতীয়াংশ লোক ex-countryment. Royal Commission on Labour (RCLI) মন্তব্য করে যে, এর ফলে চটের কারখানার ভৌগোলিক অবস্থানেরও পরিবর্তন ঘটে। আগে স্থানীয় মানুষেরা আসায় প্রতিদ্বন্দ্বী কারখানাগুলি বেশ দূরত্ব রেখে তৈরি করা হত — যেমন বজবজ, কামারহাটি গৌরীপুর। এখন প্রাচুর্যও বহির্দেশীয় উৎসের জন্য ঠিক কার হয় যে মোটামুটি যেসব জায়গাতে শ্রমিকেরা এসে জড়ো হয় (যেমন কাঁকিনাড়া) সেখানেই কাছাকাছি কারখানাগুলি তৈরি হবে —Report of The Royal Commission on Laboru, Vol 5, pt-2, P- 238, D.R. Wallace, The Romance of July (Cal 1909), Foley Report, Par 26.

৩। W.B.S.A. Judicial Dept, Police Br. January 1896, A6-11-এর রিপোর্ট দেখা যাচ্ছে, ভদ্রলোকেরা মিলের শ্রমিকদের 'Unruly' ও 'noisy' স্বভাবের জন্য অভিযোগ করেছেন।

৪। কুলদাপ্রসাদ সান্যাল মল্লিক, নবযুগের সাধনা, লোটাস লাইব্রেরি, ৫০ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলকাতা, প্রকাশের সময়কাল অনুল্লেখিত। শশীপদ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে জানা যায় যে, তাঁর পত্রিকা ভারত শ্রমজীবী-তে ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে একটি প্রবন্ধে মন্দব্য করা হয় যে, একদল খারাপ চরিত্রের শ্রমিক তাঁর দ্বারা 'সম্পূর্ণ ভদ্রলোকে' পরিণত হয়েছে। শশীপদ সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণের জন্য দীপেশ চক্রবর্তীর 'Sasipada Banerjee : A Study in the Nature of The First Contact of Bengali Bhadralok in The working Classes of Bengal' - India Historical Review, Jan, 1976' দ্রষ্টব্য।

৫। স্বদেশি আন্দোলনের যুগে বেশিরভাগ শ্বেতাঙ্গ পরিচালিত শিল্প কারখানায় দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি ও মালিকের নির্যাতনের কারণে আন্দোলন বৃদ্ধি পায়। ১৯০৫-এর অক্টোবরে কলকাতায় ট্রাম ধর্মঘট হয় ও ১৬ অক্টোবর কলকাতা জুড়ে বন্ধ হয়, সেদিন অফিস বন্ধ ছিল এবং পাটকল ও রেলের শ্রমিকরা স্ট্রাইক করেছিল। ২১ অক্টোবর প্রথম প্রিন্টার্স ইউনিয়ন তৈরি হয় ১৯০৬-এ ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়েতে কেরানিদের ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে রেলওয়েম্যানস ইউনিয়ন তৈরি হয়। চারজন ব্যক্তি অগ্রণী শ্রমিকনেতা হয়ে ওঠেন—ব্যারিস্টার অশ্বিনীকুমার ব্যানার্জী, প্রভাতকুসুম রায়চৌধুরী, অপূর্বকুমার ঘোষ ও উত্তর কলকাতার এক প্রেসের মালিক প্রেমতোষ বোস। প্রথম দিকের শ্রমিক আন্দোলন কারখানার কেরানিবাবুদের সঙ্গে সংযোগ বা তাদের মাধ্যমে পরিচালিত হত। সুমিত সরকারের মতে, 'Organisations of a predominantly illiterate Proletariat required the help of clerical intermediaries but these employees were themselves often petty expoloiterw,' Sumit Sarkar, The Swadeshi Movement in Bengal: 1903-1908, PPH, Delhi, 1973.

৬। ১৯২৯ সালের শে, থেকে ১৯২০ সালের গোড়ায় ভারতে ব্যাপক শ্রম অসন্তোষ দেখা যায় এবং ১৯২০ সালের দ্বিতীয়ার্ধে শুধু বাংলাতেই ১১০টি ধর্মঘট সংঘটিত হয়। শ্রমিক ইউনিয়নের সংখ্যাও দ্রুত বাড়তে থাকে। ১৯২০-তে ৪০টি থেকে বেড়ে ১৯২১ ও ২২-এ হয় ৫৫ ও ৭৫টি। এইসব ইউনিয়নে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী নেতারা নেতৃত্ব দিতেন। বাংলায় চরমপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী প্রভাতকুসুম রায়চৌধুরী, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, এস এন হালদার, জীতেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃণালকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃণালকান্তি বসু, হেমন্ত কুমার সরকার এবং রানিগঞ্জ ও ঝরিয়ায় রাজনৈতিক সন্ন্যাসী যথা স্বামী দর্শনানন্দ ও বিশ্বানন্দ, বোম্বেতে এম এন যোশির মতো নরমপন্থী নেতা, সাম্যবাদী এস এ ডাঙ্গে ও দক্ষিণ ভারতে সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ার মতো মার্কসবাদী নেতারা এই সময় নেতৃত্ব দিতেন। তবে এঁদের নেতৃত্ব সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। দেশীয় মালিকদের সঙ্গে বিরোধ অনেক সময় বোঝাপড়া করে এঁরা আন্দোলন থামিয়ে দিতেন। ১৯২০ সালে এস এন হালদার ও ব্যোমকেশ চক্রবর্তী প্রতিষ্ঠিত জামসেদপুর লেবার অ্যাসোসিয়েশন (JLA) এইভাবেই টাটার শ্রমিকদের হতাশ করেছিল। দ্রষ্টব্য, Sumit Sarkar, Modern India, Mac Millan India Ltd, 1983 এবং Sabyasachi Bhattacharya, "The Outsiders : A Historical Note in Asok Mitra (ed), The Truth Unutes : Essays in tribute to Samar Sen, Subarnarekha, Cal 1985.

৭। সমাজতান্ত্রিক ধারণার আগমন শ্রমিকদের সম্পর্কে প্রচলিত নীতিবোধে পরিবর্তন ঘটায়। বাঙালি ভদ্রলোক এখনও শ্রমিকদের নৈতিক অধঃপতন নিয়ে চিন্তিত, কিন্তু এখন, তার মতে, এই অধঃপতনের কারণ হল অর্থনৈতিক — যা শ্রমিকদের নিজস্ব নৈতিকতা ও সচেতনতার বাইরে। কে সি রায়চৌধুরীর ধর্মঘট নাটকে (১৯২৬ সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শে উদ্‌বুদ্ধ) শ্রমিকদের দুরবস্থার জন্য ধনী পুঁজিপতিদের স্বার্থকে দায়ী করা হয়েছে। শ্রমিক সংবাদপত্রের নাম কয়েকটা করা যায় যেগুলি এ সময় প্রচলিত হয়েছিল। ১৯২৭-এ মুজফ্‌ফর আহমেদের গণবাণী, এ এম এ জামানের সর্বহারা ১৯৩১), নজরুলের লাঙ্গল (১৯২৬), সোমনাথ লাহিড়ীর অভিযান (১৯৩০), বৈদ্যনাথ মুখার্জীর চাষী ও মজুর (১৯৩২), বিমল গাঙ্গুলির লালপল্টন (১৯২৮) ইত্যাদি।

৮। ১৯২৮ সালের ৩১ অক্টোবর অমৃতবাজার পত্রিকায় লেখা 'Condemmned to live in slums,...working long hours in closed & stuffy atmosphere & victims of drug shops, he is convertde to something less than a human being [This] condition of life...is indicental to the modern industrial system Generally, but...in very few industries the disproportion between profite & wages is so striking as this [the Jute industy]'.

৯। এ বিষয়ে তারাশঙ্কর তাঁর আমার সাহিত্য জীবন প্রথম খণ্ডে বলেছেন : 'কালি-কলমে ''শ্মশানের পথে'' নাম দিয়ে

একটি গল্প বের হল। গল্পটি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল অনেকের। এ গল্পটি আমার ভবিষ্যৎ পথের বোধ হয় প্রথম মাইলস্টোন। গল্পটি পরবর্তীকালে ''চৈতালী ঘূর্ণী'' উপন্যাস হয়ে প্রকাশিত হয়েছে এবং আমার প্রথম প্রকাশিত পুস্তক— অর্থাৎ প্রথম উপন্যাস।'—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, আমার সাহিত্য জীবন, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা শ্রাবণ ১৩৬০

১০। আমার সাহিত্য জীবন-এ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় জানাচ্ছেন যে, কাহিনির প্রথম পর্বের পিছনে আছে তাঁর বহু গ্রামে জমিদারির ও রাজনৈতিক কাজে ঘোরার অভিজ্ঞতা (এই সময়ে অর্থাৎ বিশের দশকে তিনি সক্রিয় গান্ধিবাদী ছিলেন), আর কয়লাকুঠিতে কাজের অভিজ্ঞতা দ্বিতীয় পর্বের উপজীব্য। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রকাশিত তারাশঙ্কর রচনাবলী-র প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জানাচ্ছেন যে, লেখক যখন বিষয়কর্মে নিযুক্ত তখন বোলপুর, সাঁইথিয়া প্রভৃতি বাণিজ্যকেন্দ্রে চালের কল স্থাপিত হয়েছিল, তাঁর স্বগ্রাম লাভপুরেও চালের কল স্থাপনের উদ্যোগ চলছিল। সেইসব কলের শ্রমিকেরা আশপাশের ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে থেকে আসছিল। স্বল্পবিত্ত কৃষক জমিদার-মহাজনের অত্যাচারে, ম্যালেরিয়ার নখরাঘাতে ভূমি ও ভূমিহীন হয়ে নগদ পয়সা উপার্জনের আশায়, স্বচ্ছল জীবনযাপনের মরীচিকায় এই সদ্যস্থাপিত কালের দিকে ছুটছে— এই সত্য তাঁর দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল।

প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতাপূর্ব বিভিন্ন কমিশন, যথা ফ্যাক্টরি লেবার কমিশন, রয়্যাল কমিশন অন লেবার, যুদ্ধকালীন শ্রমিক অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্টে ভারতীয় শ্রমিকদের 'কৃষক' শিকড়কে যথার্থভাবে স্বীকার করা হয়েছিল। কিন্তু একবার সংগঠিত শিল্পে আসার পর তাদের সংস্কৃতি পরিবর্তিত হয়ে বারবার শ্রমিক চরিত্র বজায় রেখেছিল এরকম একটা ভুল ধারণার সৃষ্টিও করা হয়েছিল। স্বাধীনতা পরবর্তী গবেষণাগুলিতে বিভিন্ন শিল্পে বিভিন্ন স্থান থেকে অভিপ্রয়াণকারীর নিজস্ব সংস্কৃতির উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। বাংলাদেশের শিল্পগুলির ক্ষেত্রে বিহারি শ্রমিকদের আধিপত্য বিহারের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রবল দারিদ্র্য, জমি ও স্বত্বের ভাগাভাগি, হস্তশিল্পের দ্রুত অবনতি ইত্যাদি বিষয়গুলিকে অনুসন্ধান করতে ঐতিহাসিককে প্ররোচিত করছে। গ্রামীণ জীবন, বিশেষত কৃষকজীবনের সঙ্গে সংযোগ কতগুলি বিশেষ প্রবণতার সৃষ্টি করত। প্রথম দ্বৈতসত্তা (চাষি ও শ্রমিক) মজুরদের সাম্প্রদায়িক চেতনা ও অভিমুখিনতাকে বজায় রাখত এবং তাদের যথার্থ 'শ্রেণিচেতনা' বিকশিত হতে দিত না। কৃষক জীবনের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে মালিক ও ম্যানেজারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময় ধর্মঘটী শ্রমিকেরা ছড়িয়ে পড়ত এবং ম্যানেজমেন্ট সেই সুযোগে সংগ্রাম দমন করত। অন্যদিকে নতুন গবেষকরা বলেছেন যে, যদি কৃষকের গ্রামে নির্ভর করার মতো অবলম্বন থাকত, তবে ধর্মঘট চালিয়ে যাবার পণ আরও দৃঢ় হত— Bahl, V, Class Consciousness & Primordial Values in the Shaping of the indian working Class [Sonuth Asia Bulletins XIIII (1+2), P. 151-72 (1993)]

১১। মনোরঞ্জন হাজরা, নবজীবনের পথে, পূরবী পাবলিশার্স, ১৩, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা, ১৯৮৬। লেখক নিজে শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে বিশের দশক থেকেই যুক্ত ছিলেন। ১৯৩৪ সালে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। স্বাধীনতা উত্তরকালে তিনি ১৯৪৭-এ কোন্নগর শ্রীদুর্গা কটন মিলের শ্রমিক আন্দোলনে ও ১৯৬১ - তে হিন্দমোটরসে ধর্মঘটী শ্রমিকদের নেতৃত্ব দান করেন। প্রথম ঘটনাটি অবলম্বনে তাঁর উপন্যাস ক্রাইপার রোডে ঝড় রচিত হয়।

১২। বিশ্ব বিশ্বাস, মজদুর, বর্মণ পাবলিশিং হাউস, ৭২, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

১৩। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, নবসন্ন্যাস, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৪৮। সাহিত্য সমালোচক সরোজ দত্ত তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন যে উপন্যাসের রাজনৈতিক মতাদর্শের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত যোগ কতখানি ছিল এবং ওই কয়লাখনির জীবন তিনি কোথায় পেয়েছিলেন। এতে তিনি জানান যে প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে লিপ্ত না হলেও 'স্বদেশী বিপ্লবী আন্দোলন' সম্পর্কে তাঁর গভীর শ্রদ্ধা চিল। ব্যক্তিগতভাবে গান্ধিজির মতাদর্শ সম্পর্কে তাঁর ধারণা যাই থাকুক না কেন দেশে গান্ধির যে প্রভাব ছিল তাকেই তিনি উপন্যাসে স্থান দিতে চেয়েছেন। কয়লাখনির জীবন তিনি স্বচক্ষে দেখেন ধানবাদে কাত্রাসগড় কয়লাখনি অঞ্চলে, যেখানে তাঁর ভাই কাজ করেন।

১৪। V. I. Lenin, 'What is to be done?' Collected Works (v) 1961 —লেনিনের সঙ্গে রোজা লুক্সেমবার্গের পার্থক্য প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য লুক্সেমবার্গের Speech to Foundation Congress of the German Communist Party (1918); Organizational Questions of Russian Social Democracy (1904) in J. P. Nettl's Rosa Luxemberg (Oxford 1966).

১৫। Sabyasachi Bhattacharya, 'The Oustiders : A Historical Note' in Asok Mitra (ed.) The Truth Unites : Essays in Tribute to Samar Sen, Subarnarekha, Cal, 1985

১৬। Dipesh Chakraborty, Rethinking Working Clas Histroy (1890-1940)

১৭। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারতের মর্মবাণী, পরিচয়, চৈত্র ১৩৫১ বঙ্গাব্দ

১৮। যুগান্তর চক্রবর্তী (সম্পাদিত) অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়েরি ও চিঠিপত্র, সিগনেট বুক শপ, কলিকাতা, আগস্ট ১৯৭৬